ভূমিকা (Introduction) ঃ

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের ক্রম-উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি রেখে তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্ব সমগ্র দেশের শিক্ষা সংস্কারের কথা চিন্তা করেন। শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ণকল্পে গঠিত হয় রামকৃষ্ণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন ইত্যাদি। কিন্তু সেই কমিশনগুলির নির্দেশ অনুসরণ করেও আশাব্যঞ্জক পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়নি। কোঠারি কমিশন অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের তৃতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় 1964 সালের 14 জুলাই। 1964 সালের 2 অক্টোবর কাজ শুরু করে 1966 সালের 31 মার্চ ওই কমিশন তাঁদের 692 পৃষ্ঠার সমগ্র রিপোর্টের মধ্যে যে 489 পৃষ্ঠার মূল রিপোর্ট পেশ করেন তা ছিল প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সর্বোচ্চ স্তর অবধি শিক্ষার যাবতীয় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। 1968—66 সালের এই শিক্ষাকমিশনের প্রকাশিত রিপোর্ট ভারতের শিক্ষার বিকাশের জন্য একটি বিস্তৃত রূপরেখা তৈরি করে দেয়। সেই রিপোর্টেই উল্লেখ করা হয় যে, ভারত সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশ করা উচিত। এই প্রস্তাব থেকে রাজ্য সরকারগুলি ও স্থানীয় প্রশাসনগুলি শিক্ষা-পরিকল্পনা তৈরি ও রূপায়ণ বিষয়ে নীতি-নির্দেশিকা লাভ করতে পারবে। এই প্রস্তাব অনুসারে ভারত সরকার লোকসভার সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে, যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয় জাতীয় শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করার। এই খসড়া প্রস্তাব কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের কাছে পেশ করা হয়। এরপর 1968 সালে ভারত সরকার জাতীয় নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশ করেন। এই সময় থেকে 1968 সালের জাতীয় শিক্ষানীতি শিক্ষা পুনর্গঠনের ভিত্তি বলে বিবেচিত হল। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই শিক্ষা নীতিই ছিল একটি মূল্যবান ও সর্বাত্মক শিক্ষা-দলিল। কমিসনে আলোচিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল এই রকম—

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের সে দেশের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ এবং সেই সম্পদের যথাযোগ্য বিকাশ ঘটায় দেশের শিক্ষাব্যবস্থার। তাই ভারতের সমাজব্যবস্থায় সর্বদা

Scanned with CamScanner

'শিক্ষা'কে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতারা, শিক্ষার গুরুত্ব বুঝেছিলেন বলেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকেই জাতির উন্নতিতে শিক্ষার ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। গান্ধিজি বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন যেখানে বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনমূলক শিক্ষার সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে। এই সময় গ্রাম-জীবনভিত্তিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে আরও অনেক জাতীয় নেতাদের জাতীয় শিক্ষার বিষয়ে নানা অবদান আছে।

(খ) ভারত সরকার উপলব্ধি করে যে, 1964—66 সালের শিক্ষা কমিশন যে ব্যাপক শিক্ষা পুনর্গঠনের পরামর্শ দিয়েছে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য, জাতীয় সংহতিবোধ জাগ্রত করার জন্য আদর্শ সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা উপলব্ধির জন্য শিক্ষা পুনর্গঠনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার নিবিড় যোগসূত্র রচনা করা, শিক্ষায় সমসুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার সর্বস্তরের মানের উন্নতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশের জন্য শিক্ষানীতির ব্যাপক পরিবর্তনের প্রয়োজন।

(গ) উপরিউক্ত নানা প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ভারত সরকার শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন নীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে—

(১) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা :

সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির 45 নং ধারার বাস্তব রূপ দেবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। এখানে আরও বলা হয়, 14 বছর পর্যন্ত সব শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক উন্নত মানের কার্যকর শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষায় অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয় ভর্তির নিশ্চিত করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) শিক্ষকদের যোগ্য মর্যাদাদান, বেতন প্রদান ও যোগ্য শিক্ষাদান :

(i) যেসব কারণে শিক্ষার মান ও জাতির বিকাশে শিক্ষার ভূমিকা নির্ভর করে, তাদের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য হলেন শিক্ষক। শিক্ষকের ব্যক্তিগত গুণাবলি, চরিত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাদানের ক্ষমতা ইত্যাদি গুণগুলির ওপর শিক্ষার উন্নতি নির্ভর করে। তাই শিক্ষককে সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হবে। তাঁদের যোগ্যতা ও দায়িত্ব অনুসারে তাঁদের বেতন ও চাকুরির সুবিধা দিতে হবে।

(ii) শিক্ষকরা যাতে স্বাধীনভাবে পড়াশোনা করতে পারেন, গবেষণা করতে পারেন, গবেষণা-পত্র প্রকাশ করতে পারেন ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে বক্তব্য রাখতে ও লিখতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁদের সুযোগ দিতে হবে।

Scanned with CamScanner

(iii) শিক্ষকদের শিক্ষালাভ, বিশেষত চাকুরিরত অবস্থায় শিক্ষণলাভের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

(৩) ভাষাসমূহের উন্নতি :

(i) আঞ্চলিক ভাষাসমূহ : ভারতীয় ভাষাগুলির ও সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত আছে। ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি না ঘটলে দেশবাসীর সৃজনাত্মক দিকটির বিকাশ ঘটবে না, শিক্ষার মানের উন্নতি হবে না, জ্ঞানের বিস্তার হবে না এবং বুদ্ধিজীবি মানুষ ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে আঞ্চলিক ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এদের ব্যবহারকে প্রসারিত করতে হবে।

(ii) ত্রিভাষা সূত্র : মাধ্যমিক স্তরে রাজ্য সরকারের ত্রিভাষা সূত্র কঠোরভাবে প্রয়োগ করা উচিত। ত্রিভাষা সূত্র বলতে বোঝায় একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (হিন্দিভাষী রাজ্যে যেটি একটি দক্ষিণি ভাষা হওয়া উচিত এবং অহিন্দিভাষী রাজ্যে যেটি আঞ্চলিক ভাষা হবে), হিন্দি এবং ইংরাজি। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে উন্নত মানের হিন্দি ও ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(iii) হিন্দি ভাষা : হিন্দি ভাষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। হিন্দিকে একটি যোগসূত্রকারী ভাষা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে ও খেয়াল রাখতে হবে সংবিধানে নির্দেশিত ৩৫১ নং ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখতে যেন ভারতের গৌরবব্যঞ্জক বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির সব উপাদান প্রকাশ করা যায়। অহিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যে হিন্দি শিক্ষার জন্য কলেজ ও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হবে, যেখানে থাকবে হিন্দিকে সর্বভারতীয় ভাষা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার উৎসাহ।

(iv) সংস্কৃত : ভারতীয় সমস্ত ভাষাগুলির উন্নতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে এবং দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতের একটি বিশেষ অবদান আছে। কারণ সংস্কৃতকেই ভারতের যাবতীয় ভাষাসমূহের জননী বলে অধিকাংশ শিক্ষাবিদ স্বীকার করেছেন। তাই বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃত ভাষা চর্চার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে হবে। এই ভাষা শিক্ষার জন্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। স্নাতক স্তরে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন, আধুনিক ভারতীয় ভাষাশিক্ষা, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ভারত তত্ত্ব, ভারতীয় দর্শন শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ভাষার শিক্ষাকে প্রয়োগ করতে হবে।

(v) আন্তর্জাতিক ভাষা : ইংরাজি ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ভাষাশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্বে জ্ঞানের ক্ষেত্র দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে, অভাবনীয় উন্নতি হচ্ছে

Scanned with CamScanner

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার। ভারত শুধু এই উন্নতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললে না, তাকে এইসব ক্ষেত্রে নিজের বিশ্বজনীন অবদানও রাখতে হবে। স্বাভাবিক কারণে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা একান্তই প্রয়োজন।

(৪) শিক্ষার সমসুযোগ ঃ

প্রস্তাবে বলা হয়, শিক্ষার সমসুযোগ সৃষ্টির জন্য বিশেষ নজর দিতে হবে। সেই সুযোগ বণ্টন বিষয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশগুলি দেওয়া হয়।

(i) শিক্ষালাভের সুযোগের মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষম্য আছে তার সংশোধন করতে হবে এবং গ্রামীণ এলাকা ও বিভিন্ন পশ্চাৎপদ এলাকায় শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা করতে হবে।

(ii) সামাজিক ঐক্য ও জাতীয় সংহতি রক্ষার জন্য ১৯৬৪-৬৬ সালের শিক্ষাকমিশন যে 'কমন স্কুলের' কথা বলেছেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ বিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধি করতে হবে, 'পাবলিক স্কুল' বা 'বিশেষ স্কুলে' মেধার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করতে হবে। কিছু মেধাবী ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ দিতে হবে। সংবিধানের ৩০নং ধারায় যে সংখ্যালঘুদের শিক্ষার সুযোগের কথা বলা হয়েছে, সে বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(iii) বালিকাদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। শুধু সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য নয়, সামাজিক উন্নতির জন্যেও বালিকাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

(iv) অনুন্নত শ্রেণি বিশেষত উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের বিশেষ চেষ্টা করতে হবে।

(v) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তারা যাতে সাধারণ স্কুলে পড়তে পারে সে জন্য সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা গঠন করতে হবে।

(৫) মেধার অন্বেষণ ঃ

বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের বিশেষ মেধা বা প্রতিভা আছে যত শীঘ্র সম্ভব তা অনুসন্ধানে তৎপর হতে হবে। তাদের প্রতিভা স্ফুরণের যথোচিত ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

(৬) কর্ম-অভিজ্ঞতা ও জাতীয় পরিসেবা ঃ

পারস্পরিক পরিসেবা ব্যবস্থা ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে বিদ্যালয় ও সমাজকে পরস্পরের কাছে আসতে হবে। কর্ম-অভিজ্ঞতা ও জাতীয় পরিসেবার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচিতে যোগদান করা শিক্ষাসূচির একটি অঙ্গ। এই কর্মসূচি জাতীয় পুনর্গঠনেও সাহায্য করে। এর ফলে স্বনির্ভরতা, চরিত্রগঠন ও সামাজিক দায়বদ্ধতার মনোভাব গড়ে উঠবে স্বাভাবিকভাবে।

Scanned with CamScanner

(৭) বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা ঃ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান ও গণিত বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার অঙ্গ বলে বিবেচিত হবে।

(৮) কৃষিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা ঃ

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন আছে এই দুটি শিক্ষার বিষয়ে।

(i) কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষ। সুতরাং প্রতিটি রাজ্যে অন্তত একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা অবশ্যই প্রয়োজন এবং এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেই খুব ভালো হয়। তবে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পৃথক পৃথক কলেজেও পড়াবার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও কৃষি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে পড়াবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(ii) শিল্প ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ লাভ করার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। কারিগরি শিক্ষাও গবেষণা শিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই শিল্পকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে নিয়ত যোগাযোগ ও সহযোগিতা করার ব্যবস্থা রাখতেই হবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বিশেষভাবে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করতে হবে।

(iii) দেশের কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য কারিগরি ক্ষেত্রে মানবসম্পদের চাহিদা কতখানি তা সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এবং চাহিদা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির মানবশক্তি জোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ স্বচ্ছল উপার্জনের সুযোগ সর্বদা থাকে।

(৯) পাঠ্যপুস্তক রচনা ঃ

প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ যেন শিক্ষার মনোন্নয়নে উৎকৃষ্ট পুস্তক রচনা করেন সে জন্য তাঁদের উৎসাহিত করতে হবে এবং যোগ্য সম্মান দিতে হবে। স্কুল ও কলেজের জন্য উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্য বই-এর দাম সীমিত রাখতে হবে যেন তা ছাত্ররা সহজে কিনতে পারে।

একটি 'স্বশাসিত পুস্তক আয়োগ' গঠন করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। সারা দেশে কয়েকটি সাধারণ পাঠ্যপুস্তক চালু করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশু পাঠ্যপুস্তক ও আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পুস্তক রচনার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

(১০) পরীক্ষা ব্যবস্থা ঃ

পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে যাতে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা বজায় থাকে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত উন্নয়ন বিচার করা সম্ভব হবে।

Scanned with CamScanner

(১১) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ঃ

(i) মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নতির একটি অন্যতম পদ্ধতি। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

(ii) কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। তবে এই ধরনের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে খতিয়ে দেখা দরকার উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে এই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন কতখানি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ঔষধ শিল্প ও জনস্বাস্থ্য, গৃহব্যবস্থাপনা, শিল্পকলায় এই বৃত্তিশিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করতে হবে।

(১২) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ঃ

(i) বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভরতির সংখ্যা স্থির করতে হবে।

(ii) বিশেষ বিবেচনা করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করে তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে শিক্ষার মানও বজায় রাখতে হবে।

(iii) স্নাতকোত্তর স্তরের পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দিতে হবে। প্রশিক্ষণ ও গবেষণার উন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(iv) উন্নত শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে আরও সংগঠিত করতে হবে এবং এই ধরনের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে 'গুচ্ছ' তৈরি করে সর্বোচ্চ মানের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(v) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। গবেষণাগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অধীনে রাখা উচিত, অথবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সংযোগরক্ষা করে তাদের কাজ করা উচিত।

(১৩) আংশিক সময়ের শিক্ষা ও ডাকযোগে শিক্ষা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে আংশিক সময়ের শিক্ষা ও ডাকযোগে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটাতে হবে। এ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে মাধ্যমিক স্তরে, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য এবং কৃষি, শিল্প বা অন্যান্য ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্যও। পূর্ণ সময়ের শিক্ষার সমমর্যাদা দিতে হবে এ ধরনের শিক্ষাকে। এর ফলে যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে বাধ্য হয় অথচ আরও শিক্ষালাভে ইচ্ছুক থাকে তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

(১৪) সাক্ষরতা প্রসার ও বয়স্ক শিক্ষা ঃ

(i) জাতীয় উন্নতির দ্রুত প্রসার এবং সার্থকভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটাতে হলে সাক্ষরতার প্রসার ঘটাতে হবে

Scanned with CamScanner

বিভিন্ন বাণিজ্যিক, শিল্প ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের কার্যকারী সাক্ষরতা অবশ্যই দিতে হবে। সরকার অধিকৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে উপযুক্ত পথপ্রদর্শক। শিক্ষক ও ছাত্রদের সাক্ষরতা প্রসারের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

(ii) কম বয়সি কৃষিকাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর সাক্ষরতা দানে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে এবং তরুণ-তরুণীদের স্বনির্ভর কাজে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(১৫) খেলাধুলা ঃ

দেশের খেলাধুলার বিশেষ উন্নতি ঘটাতে হবে। যারা এ বিষয়ে প্রতিভাবান তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া সাধারণ ছাত্রদেরও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ও খেলোয়াড়সুলভ শারীরিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। যেখানে খেলার মাঠ বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নেই সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সেই সব সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

(১৬) সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ঃ

সংখ্যালঘুদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী করে তুলতে হবে।

(১৭) শিক্ষাকাঠামো ঃ

দেশের সর্বত্র মোটামুটি একই ধরনের শিক্ষাকাঠামো থাকা বিশেষ সুবিধাজনক। শিক্ষা কাঠামো হওয়া উচিত ১০ + ২ + ৩। যেখানে যেরকম প্রয়োজন সেই অনুযায়ী + ২ স্তরের শিক্ষা স্কুলে বা কলেজে দেওয়া যেতে পারে।

(ঙ) উপরিউক্ত শিক্ষা-পুনর্গঠন সংক্রান্ত নীতিগুলি কার্যকারী করার জন্য প্রয়োজনে শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ অন্তত শিক্ষাখাতে ব্যয় করা প্রয়োজন।

(চ) ভারত সরকার উপলব্ধি করেছে যে, শিক্ষা পুনর্গঠন করা খুব সহজ কাজ নয়। শুধু অর্থের ঘাটতি নয়, আরও নানা জটিল দিক আছে। শিক্ষার, বিশেষত বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন দেশের বস্তুগত ও মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য। তাই কেন্দ্রীয় সরকার তার নিজস্ব কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির বিকাশের জন্য যেসব কর্মসূচি রাজ্য সরকারগুলি গ্রহণ করছে, সেক্ষেত্রেও সাহায্য করবে। এখানে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের মধ্যে সমন্বয় স্থাপিত হবে।

(ছ) ভারত সরকার প্রতি পাঁচ বছর অন্তর শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে ও ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য নির্দেশনা দেবে।

Scanned with CamScanner